Vol. 34 | No. 2 | 1991

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মনসামঙ্গল কাব্য : চাঁদ সদাগরের শ্রেণী-চরিত্র

Volume	34
Issue	2
Year	1991
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোহাম্মদ হাননান
Published online	February 1, 1991
DOI	10.62328/sp.v34i2.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v34i2.8
Pages	183-214
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মনসামঙ্গল কাব্য : চাঁদ সদাগরের শ্রেণী–চরিত্র

মোহাম্মদ হাননান

মানব–ইতিহাসের ক্রমবিকাশের ধারা পর্যালোচনা করলে এ সত্যটি মেনে নিতে হয় যে, সমাজ ও সভ্যতার আজকের অগ্রগতির পেছনে রয়েছে এক বিরাট ইতিহাস। সমাজবিশ্লেষকেরা একে শ্রেণী–সংগ্রামের ইতিহাস অভিধায় চিহ্নিত করেছেন: 'আজ পর্যন্ত যত সমাজ দেখা গেছে তাদের সকলের ইতিহাস শ্রেণী–সংগ্রামের ইতিহাস।'[১]

–এ মন্তব্যকে যথার্থ মনে করলে বাংলাদেশের সমাজ ও সভ্যতার বিকাশের ধারণাকেও এর সঙ্গে অভিন্ন বলেই ধরে নেওয়া যায়।

কিন্তু ঠিক কোন সময়টা থেকে বাংলাদেশে মানব–ইতিহাস তথা লোকবসতির শুরু তা এখনো অজ্ঞাতই রয়ে গেছে। সুতরাং এ সম্পর্কে আগ্রহী সমাজ–গবেষকের প্রশ্নের শেষ নেই: 'বাংলাদেশের ইতিহাসে কোথায় কেমন করে লুকিয়ে আছে সেই অনিবার্য শ্রেণী সংগ্রাম ইতিহাসকে যা সামনে ঠেলে নিয়ে যায়? সমাজে–রাষ্ট্রে–সংস্কৃতিতে যা দুরপনের ছাপ ফেলে?'[২]

অবশ্য ধরে নেওয়া যায় দুনিয়ার সকল সমাজের যে ধারা, বাংলাদেশের সমাজবিকাশের ধারা তার ব্যতিক্রম নয়, বরং এ সমাজে শ্রেণী–দ্বান্দ্বিক জীবনের এক অনিবার্য বিকাশ ঘটেছিল, যার ছাপ রয়ে গেছে তার সাহিত্য, সংস্কৃতি, স্থাপত্যকলা ইত্যাদিতে।

বলাবাহুল্য, এসব সূত্র প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। তাই এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত তথ্য–চিহ্ন, প্রাচীন গ্রন্থাদি ও অন্যান্য সূত্রে যতোটুকু সাক্ষ্য পাওয়া যায়, তাতে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিষয়টি বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত দুরূহ। অথচ সামাজিক অবস্থানের বৈপরীত্য এ সমাজে যে কি পরিমাণ সংকটাপূর্ণ ছিলো তা শুধু অনুমানের ব্যাপার নয়, একটি ঐতিহাসিক সামাজিক সত্যও

বটে। আর এ সত্য থেকে এ অঞ্চলে শ্রেণী-সংগ্রামের ধারা যে নিয়ত সক্রিয় ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়।

এসব নানা সূত্রে সমাজের দুটি শ্রেণীর পাশাপাশি অবস্থান এবং দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের প্রমাণ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, যা বাংলাদেশের সমাজজীবনের ইতিহাসের মতাদর্শগত বিরোধ ও শ্রেণীদ্বন্দ্বের বাস্তবতাকে উচ্চকিত করে। অর্থাৎ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় ক্রমাগতভাবে শ্রেণীসংগ্রামের বা দ্বন্দ্ব-সংঘাত কিংবা বিরোধ-বিক্ষোভ অথবা বিদ্রোহের যে ধারা বয়ে চলছিল তা মূলত বিভিন্ন মতাদর্শকে আশ্রয় করেই। এ মতাদর্শগুলি মূলগতভাবে মনে হয় কতকগুলি ধর্মীয় আদর্শই। আপাতদৃষ্টিতে অনেক সময় অনুভূত হয়, এ হচ্ছে একটি ধর্মীয় আদর্শের বিরুদ্ধে পাল্টা আরেকটি ধর্মীয় আদর্শেরই বিরোধ। এ ছাড়া এ সময়কালে ধর্মীয় ভাববাদী আদর্শের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-বিরোধ ঘটেছিল বস্তুবাদী আদর্শেরও।

কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসে বিষয়টা শুধু ধর্মীয় আদর্শের বা মতবাদেরই বিরোধ নয়। কারণ যে সময়টার কথা আমরা আলোচনা করছি, সে কালে, আদর্শ বলি, মতবাদ বলি, রাজনৈতিক নীতিমালার কথাও যদি ধরি, তার সবটারই মাধ্যম ছিল ধর্মীয় মতাদর্শ। একজন সমাজ-গবেষকের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য:

> 'প্রাচীন ও মধ্যযুগের যে কোন সামাজিক দ্বন্দ্বই যে ধর্মের দ্বন্দ্ব বা দেবতার দ্বন্দ্বরূপে স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশিত হয় তাহা তো জানা কথা।' [৩]

সেদিক থেকে এ বিষয়টি অনুধাবনযোগ্য যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় ধর্মীয় মতাদর্শসমূহ শুধুমাত্র ধর্মীয় অনুশাসন অথবা নীতিমালাই নয়, এ যেমন রাজনৈতিক মতবাদ, তেমনি অর্থনৈতিক সামাজিক মতবাদও। ধর্মমতের আবরণে তা প্রকাশিত হয়েছে মাত্র।

আর এ সময়কালে এ অঞ্চলে যত মতাদর্শের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে, তার প্রায় সবটাই শ্রেণীসংগ্রামজাত। ইতিহাসে দেখা গেছে, কখনো বস্তুবাদী আদর্শের সঙ্গে ভাববাদী আদর্শের দ্বন্দ্ব, আবার কখনো গোড়া ভাববাদী মতাদর্শের সঙ্গে উদারনৈতিক ভাববাদী আদর্শের সংঘাত, কখনো কখনো একই মতাদর্শের মধ্যেই আন্ত-মতাদর্শগত বিরোধ চলেছে।

বাংলাদেশসহ ভারতীয় উপমহাদেশে আর্য-অনার্য মতাদর্শ ও সংস্কৃতির মধ্যে যে কঠিন বিরোধ ও সংঘর্ষ হয়েছে, তা শুধুমাত্র ইতিহাস-স্বীকৃত ব্যাপার নয়, এটা এ-অঞ্চলের অন্যতম প্রধান ঘটনাও। এ-বিরোধীয় সংগ্রাম প্রতিনিয়ত আলোড়িত করেছে সমাজজীবনকে অথবা সমাজ-মানুষকে কিংবা বলা চলে, সমাজের মানুষই শ্রেণীবৈষম্যের শিকার হতে শতাব্দীর পর শতাব্দী বিভিন্ন মতাদর্শের ছায়ায় এ সংগ্রামকে বয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে।

ইতিহাসের ক্ষীণ সূত্র ধরে, যেসব তথ্য পাওয়া যায়, তাতে প্রতীয়মান হয়, মতাদর্শসমূহ কখনো কোনোটি উচ্চশ্রেণীর জন্য, আবার কোনো-কোনোটি নিম্নশ্রেণীর মানুষের হয়ে কাজ করেছে। উচ্চ-শ্রেণীর মানুষ তাদের শাসন ও শোষণকে অব্যাহত রাখার জন্য কোনো এক ধর্মীয় মতাদর্শকে যেমন ব্যবহার করেছে, নিম্নশ্রেণীর মানুষও মুক্তির অন্বেষায় পাল্টা অন্য আরেকটি মতাদর্শকে আঁকড়ে বেঁচে থাকতে চেয়েছে।

শ্রেণীবিভক্ত এ সমাজে অধিপতি ও শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে এই যে সংগ্রাম চলছিলো অব্যাহত গতিতে, কেউ ইচ্ছা করেও তার বাইরে থাকতে পারেনি, বিশেষ করে শিল্পীরা তো নয়ই। বাংলাদেশের প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবি ও শিল্পীরাও তা থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি। কারণ সমাজজীবন থেকেই শিল্পীরা তাদের উপাদান সংগ্রহ করে থাকেন। আর শ্রেণীদ্বন্দ্বে আকীর্ণ সমাজজীবন থেকে তাঁরা যে উপাদান সংগ্রহ করেছেন তাও শ্রেণীসংগ্রাম আশ্রিত হবে তাই তো স্বাভাবিক। তবে সাহিত্যে আশ্রিত শ্রেণীসংগ্রাম, রাজনৈতিক শ্রেণীসংগ্রামের চেয়ে সম্ভবত আরো ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ। সাহিত্যের শ্রেণীসংগ্রাম জনগণের প্রবৃত্তির সংগ্রাম, প্রভুত্ব ও দাসত্বের ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে, ধর্মগত বন্ধ্যাত্বের বিরুদ্ধে, নিষ্ঠুরতার রিরুদ্ধে, ভণ্ডামীরও বিরুদ্ধে।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন থেকে শুরু করে সর্বত্র এ মতাদর্শগত বিরোধ ও শ্রেণীসংগ্রামের রূপায়ণ আমরা লক্ষ্য করি। চর্যাপদে শ্রেণীমানুষের দুঃখ-বেদনার চিত্রায়ণ এতো তীব্র যে এর সংবেদনশীলতা সকল সামাজিককেই আলোড়িত করে।

চর্যাপদের পর বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় শ্রেণীবৈষম্যে পতিত এ মানুষের প্রতিচ্ছবি আরো বেশী করে লক্ষ করা যায়। এ পর্যায়ে শ্রেণীবৈষম্যের পাশাপাশি শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

'সেক শুভোদয়া', 'শূন্য পুরাণ', এমনকি এ পর্বে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'ও মতাদর্শগত বিরোধের রূপায়ণ লক্ষ করি। সমাজধর্মের প্রাবল্যের বিরুদ্ধে হৃদয়বৃত্তির বিজয় ঘোষণার মধ্যে এ কাব্যের বিদ্রোহের স্বরূপ উন্মোচিত।

মঙ্গলকাব্যধারার রচনাসমূহের মধ্যে মনসামঙ্গলের পরে চন্ডীমঙ্গলে রূপায়িত মতাদর্শগত বিরোধ ও শ্রেণীদ্বন্দ্বের স্বরূপ নবরূপে উন্মোচিত। অরবিন্দ পোদ্দার চণ্ডীমঙ্গলকাব্য সম্পর্কে বলেছেন, এ হচ্ছে, "অবনমিত সম্প্রদায়ের উপরে ওঠার ইতিহাস'।[৪]

প্রজা শোষণের দায়ে শোষকসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে শোষিতের সম্মিলিত বিদ্রোহ এ কাব্যকে আরো মহিমান্বিত করেছে। জুলুম-নির্যাতনহীন একটি রাজ্য গড়ে তোলার স্বপ্ন একাব্যে সাধারণ মানুষের চেতনায় যেভাবে দানা বেঁধে উঠেছিল বাংলাসাহিত্যে তা তুলনা-রহিত।

ধর্মমঙ্গলকাব্যে বর্ণবাদকে অস্বীকার করার প্রচেষ্টার মধ্যে মতাদর্শগত বিরোধ রূপায়িত হতে দেখি। লৌকিক জীবনাদর্শের রূপক লাউসেনকে আশ্রয় করে এ কাব্যে নিম্নশ্রেণীর মানুষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। মধ্যযুগের সমাজ, ধর্মীয় গোড়ামি, সংস্কার ও সাম্প্রদায়িকতায় জীর্ণ হয়ে পড়েছিল। এর বিপরীতে অর্থাৎ শাস্ত্রীয় গণ্ডির বাইরে এসে যারা মানুষ ও মানবতাকেই একমাত্র চরম ও পরম হিসাবে ঘোষণা করলেন তারা বৈষ্ণব। বৈষ্ণব পদাবলী ও চৈতন্য-সাহিত্য মানুষের মুক্তির বাণীর সাহিত্য-আকর।

এরই ধারাবাহী সমন্বয়ধর্মী বাউল মতবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে বাউলদের রচিত পদাবলী সাহিত্যে। সমাজদেহের বিভিন্ন মতাদর্শীয় ও শ্রেণীভেদের বিরুদ্ধে উচ্চকিত বাউল পদাবলী বাংলা সাহিত্যের মতাদর্শগত বিরোধ ও শ্রেণীদ্বন্দ্বের ধারাবাহিক ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ।

তবে মনসামঙ্গলকাব্যে মতাদর্শগত বিরোধ ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব যেমন উচ্চকিত রূপ লাভ করেছে বাংলা সাহিত্যে তা তুলনা-রহিত। কারণ মনসামঙ্গলের বিস্তৃত পটভূমিতে আছে সরাসরি পরস্পরবিরোধী দু'টি শ্রেণী-একটি উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়, অন্যটি নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীন সম্প্রদায়। এ দু'য়ের পারস্পরিক স্বার্থ-

দ্বন্দ্বই, মনসামঙ্গলের কাহিনীগত ইতিহাসের মূলকথা। প্রথম শক্তিটি এখানে আধিপত্যকামী, দ্বিতীয় শক্তিটি প্রতিষ্ঠাকামী।

সমাজের বিভিন্নস্তরের মানুষের সমন্বয়ে, সমর্থনে দ্বিতীয় শক্তির স্বীকৃতি আদায়ের প্রচেষ্টায় প্রথম শক্তিটি বাহুবলে এবং আদর্শবাদের নামান্তরে যেভাবে বিরোধিতা করে সংঘাত-সংঘর্ষের জন্ম দিয়েছিল তা মূলত শ্রেণীসংগ্রামেরই মূল গাঁথা। উচ্চশ্রেণী তাদের প্রয়োজনের তাগিদে ও নিম্নের আর্দশকে ঠেকিয়ে রাখার অনমনীয় মনোভাবে পাল্টা ধর্ম ও দেবতার নাম পর্যন্ত ব্যবহার করেছে।

মনসামঙ্গলের শ্রেণীদ্বান্দ্বিক ঘটনাবহুল কাহিনীটি তাই মতাদর্শগত বিরোধেরও একটা পটভূমি সৃষ্টি করে।

বিরোধের এ পটভূমি বাংলা সাহিত্যের সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিশেষ করে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে চাঁদ সদাগর ছিলেন এ বিরোধাত্মক ভূমিকার প্রধান পুরুষ। চাঁদ সদাগর মানুষ এবং তিনি দাঁড়িয়েছেন একজন দেবীর বিরুদ্ধে-এমন একটা চেতনাই সমালোচকদের কাছে হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে। ফলে সমালোচক লিখেন:

> ১· 'পশ্চিম-বাঙলা থেকে মুসলিম প্রভাব এসে যেদিন পূর্ব-বাঙলায় পৌছল, সেদিন কিন্তু সাহিত্য ধর্মের বিপ্লব আর ঠেকিয়ে রাখা গেল না। -পশ্চিম-বাঙলার হিন্দুমানসে ইসলামের সংঘাতে জেগেছিল বৈষ্ণব গীতিকা, পূর্ব-বাঙলার হিন্দুমানসে সে সংঘাতে জাগল মনসামঙ্গল।- মনসামঙ্গল-পরিমণ্ডলে মানুষের সামাজিকতাই প্রধান উপাদান। এ রূপান্তরের ফলে চাঁদ সদাগর ও বেহুলার ভাগ্য বিপর্যয় মনসামঙ্গলের কাব্য প্রাণ।' [৫]
>
> ২· 'মানুষ চাঁদ মহিমায় দীপ্তিমান, কেননা তার সৃষ্ট দেবতা অসভ্যতার ধোঁয়ায় ম্লান'।[৬]
>
> ৩· 'মনসামঙ্গলের কাহিনী দেব-মানবের সংগ্রামের কাহিনী -সে সংগ্রামে সন্ধি হয়েছে, মানবভাগ্য পরাজয়ের গ্লানি বহন করেনি।-চাঁদ আত্মসমর্পণ করেনি-সে হার মেনেছে এক বালিকার অতুল্য কৃচ্ছসাধনা ও সিদ্ধির কাছে'। [৭]
>
> ৪· 'মনসামঙ্গলের দুই প্রধান চরিত্র চাঁদ সওদাগর ও বেহুলা পূর্ব বাঙলার দুই বিদ্রোহী ব্যক্তিত্ব। চাঁদ সওদাগরের পৌরুষ মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে অতুলনীয়'।[৮]

৫' 'কাব্যের সবচেয়ে আকর্ষণীয় চরিত্র অবশ্যই চাঁদ সদাগর। পেশায় সে বণিক, ধর্মে শৈব। -শিবের মহাভক্ত, মহাজ্ঞানী চাঁদকে লোভ বা ভয় কোনটাই কাবু করতে পারে না।' ৯

বস্তুত এভাবেই মনসামঙ্গলের কাহিনীর আসল সামাজিক তাৎপর্য ঢাকা পড়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে, মনসামঙ্গলকাব্যে মনসা শুধু দেবী মাত্র নন, সেও অধিকারহীনা। তারও সংগ্রাম ছিল মনসামঙ্গল কাব্যে। তার সংগ্রাম তার অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, যে অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এর বিরুদ্ধে তার আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। বস্তুত এভাবেই মনসামঙ্গলে মনসা লৌকিক জীবনাদর্শের সংগ্রামের প্রতীক হিসাবে দাঁড়িয়ে যায়। দ্বন্দ্বটি তাই শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায়, পৌরাণিক ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে লৌকিক জীবনাদর্শের। সামাজিক ক্ষেত্রে লৌকিক জীবনাদর্শের ধারক-বাহক নিম্নশ্রেণীর মানুষ, পৌরাণিক ভাবাদর্শের উচ্চকোটির সমাজ-বিধায়কদের কাছ থেকে নিজেদের স্বীকৃতি আদায় করেছিল। মনসামঙ্গলের আসল সামাজিক তাৎপর্য এখানেই।

মনসামঙ্গলকাব্য সৃষ্টির পেছনে সামাজিক ইতিহাসের স্বাক্ষর পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে মনসামঙ্গলের কাহিনীগত দিক অত্যন্ত তাৎপর্যময়। সমাজে ব্রাহ্মণ্য মতাদর্শ জনমানসের যে অংশকে পরিত্যাগ করতে চেয়েছিল, প্রায় সকল মঙ্গলকাব্যেই লোকধর্ম তাদেরই গৌরবের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেছে। রক্ষণশীল ধর্মীয়-আচারবিরোধী লোকায়ত ধারা দীর্ঘকাল থেকেই এ দেশীয় সমাজমানসে সুপ্ত ছিল। যখনই অমানবিক রীতি-নীতি সমাজমানুষকে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে ধরতে চেয়েছে, তখনই লোকায়ত ধর্ম ও মত এবং পথকে আশ্রয় করে গণমানুষের মুক্তি-কামনা উৎসারিত হয়েছে। একজন সমাজবিশ্লেষক এ-প্রসঙ্গে বলেন:

'সেন রাজশক্তি ব্রাহ্মণ্য দেব-দেবীকে, ব্রাহ্মণ্য ধর্মীয় সকল আনুষ্ঠানিকতাকে, ব্রাহ্মণদের স্মৃতি ও ন্যায়ের শাসনকে, পুরোহিতদের সকল মতলবী বিধানকে,- বাংলার মানুষের মাথার উপর বিষম বোঝার মতো চাপিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করলো। বাংলার লোকসমাজও বসে থাকলো না। বাস্তবে যা-ই হোক, মানস-সৃজনে সে পিছিয়ে রইলো না। লৌকিক দেব-দেবীদের সে খাড়া করলো ব্রাহ্মণ্য দেব-দেবীর বিপরীতে; পরিণামে, এই বাংলায়, ব্রাহ্মণ্য দেবতা ম্লান হয়ে গেলো লৌকিক দেবতার রূঢ় ক্রূর কঠিন ও আক্রমণাত্মক উপস্থিতির সামনে।-

ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যাধীন শ্রেণী সমাজের সংস্কৃত দেবতাদের মুখোমুখি যখন দাঁড়াতে হলো আদিম সমাজের এই মানুষদের, তখন শ্রেণীসংগ্রামের প্রয়োজনেই তাদের

> দেবতাদের আদিম অমার্জিত জঙ্গীরূপকে আরো তীব্র করে নিতে হয়েছিল, ব্রাহ্মণ্য দেবতাদের সামনে চ্যালেঞ্জ হিসেবেই লৌকিক দেবতারা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।'[১০]

স্বভাবতই এ লৌকিক মতাদর্শী দেব-দেবীসমূহ ছিল আর্য-বিরোধী অনার্য-চেতনা প্রসূত। মনসাও তা-ই। 'পণ্ডিতসমাজে মনসা অবৈদিক অপৌরাণিক লৌকিক দেবতারূপে স্বীকৃতা।'[১১]

অনার্যগোষ্ঠী সম্বন্ধে একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে, এদের সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। আর এভাবে আর্যেতর সমাজ মাতৃতান্ত্রিক বলে এদের ভিতরে মাতৃদেবতার প্রাধান্যও বেশী। সেন আমলে বৈদিক মতবাদীদের চরম অভ্যুত্থানে এরা (অনার্য লৌকিক দেবীরা) অনেকটা বিলুপ্তির দিকে চলে যায়, কিন্তু:

> 'মুসলমান বিজয়ের পর হইতে উচ্চকোটির ধর্মমতের উপরে যখন প্রবল আঘাত দেখা দিল, তখন স্বাভাবিক ভাবেই সমাজ দেহের অন্যান্য স্তর হইতে এই মাতৃতান্ত্রিকতার প্রবণতা প্রবল হইয়া উঠিল এবং তাহার ফলেই হয়ত বাঙলাদেশে মাতৃপূজা ও শক্তি সাধনার এত প্রসার।'[১২]

আর্যেতর এ যে সমস্ত দেব-দেবী নিয়ে এক নতুন সাহিত্য গড়ে উঠলো তাকে আর্য-অনার্য মতবাদের বিরোধের ফসলও বলা চলে। কারণ পূর্বে আর্য-সমাজের সৃষ্ট ব্রাহ্মণ্যধর্মের কাছে নিম্নশ্রেণীর পূজিত এ আর্যেতর দেব-দেবী স্বীকৃতি লাভ করতে পারেনি।

মঙ্গলকাব্যসমূহের উদ্ভবের নানা কারণ পর্যালোচনা কালে আশুতোষ ভট্টাচার্যও ধর্মীয় সংঘাতকেই মুখ্য মনে করেছেন। তিনি বলেন:

> 'হিন্দু ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের সংঘাতের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ যেমন সংস্কৃত পুরাণগুলির সৃষ্টি হইয়াছিল, বাংলাদেশে হিন্দু সমাজের সঙ্গে মুসলমান সমাজের প্রথম সংঘর্ষের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তেমনই মঙ্গল-কাব্যগুলি উদ্ভব হইয়াছিল।'[১৩]

এছাড়া, মঙ্গলকাব্যগুলির তাৎপর্যপূর্ণ দিক সম্ভবত এই যে, এগুলি হচ্ছে রূপক কাব্য। সমসাময়িক ঘটনাবলী, সংঘাত, আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, টিকে থাকার অধিকারের স্বীকৃতির লড়াই ইত্যাদি রাজনৈতিক বিষয়াবলীও কবিগণ দেব-দেবীর সংগ্রামের গাঁথায় রূপান্তরিত করে নিয়েছিলেন। সেদিক থেকে লক্ষ করি, সকল মঙ্গলকাব্যে মানুষ এবং মানুষের কথাই মুখ্য, দেবতা সেখানে নিছক উপলক্ষ-রূপক মাত্র।

সমাজের নিম্নস্তরে মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীসমূহের এতো যে জনপ্রিয়তা তার সমাজতাত্ত্বিক কারণও এখানে নিহিত। নিম্নশ্রেণীর বলে কথিত সমাজ-মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারিক চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বিষয়ের সঙ্গেই বেশী ঘনিষ্ঠ থাকতে চায়। কারণ তার চাহিদা স্বল্প কিন্তু আবশ্যিক। নিম্ন-শ্রেণীর মানুষের কাছে দুনিয়ার ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতিতে ইহলোকের সাময়িক সুখ-শান্তির প্রশ্নটিই বড়। তাই লক্ষণীয়, পৌরাণিক দেবতার কাছে প্রাচীন ও মধ্যযুগের সমাজ-মানুষ গিয়েছে পরলোকের স্বর্গের আশায়। কিন্তু লৌকিক দেবীর কাছে মানুষের কামনা তাৎক্ষণিক সমস্যার সমাধান।

সেদিক থেকে মঙ্গলকাব্যধারার কবিতাসমূহে সত্যিকার অর্থেই শ্রেণীচেতনা রয়েছে। এ-কাব্যধারা লোকায়ত মতবাদীদের মতো বস্তুজগতের কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষাকেই ব্যক্ত করেছে। লোকায়ত ইত্যাদি মতাদর্শ অনার্য তথা আর্যেতর সমাজের। মঙ্গলকাব্যগুলির বিষয়গত উপাদান ও ভাববস্তুও আর্যেতর সমাজের-অনার্যগোষ্ঠীর। সেদিক থেকে মঙ্গলকাব্য, বিশেষ করে মনসামঙ্গল আর্য-অনার্য মতাদর্শের সংঘাত-পরিচয় সংবলিত উপাখ্যানও।

মঙ্গলকাব্যের ভাববস্তু তার অনার্যত্ব ও প্রাচীনত্বকে প্রমাণ করে। যদিও মঙ্গলকাব্যসমূহের রচনাকাল মূলত পনের শতক থেকে আঠার শতক পর্যন্ত, কিন্তু এ কাব্যের কাহিনী, ঘটনা, মূল বিষয়বস্তু ইত্যাদিতে প্রাচীন কালের স্মৃতি বহন করছে। সুকুমার সেন অনুমান করেছেন, 'মনসার কাহিনীর সূত্রপাত বৈদিক যুগে।' [১৪] বিশেষ করে দুটি প্রধান মঙ্গলকাব্যের কাহিনী হচ্ছে বণিকশ্রেণীর কাছে দু'জন দেবীর প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। স্পষ্টতই বোঝা যায়, এ হচ্ছে, সে সমাজের কাহিনী, যে সমাজে বণিকরা নিয়ামক শক্তি, অথবা এদের প্রতিপত্তি, সামাজিক মর্যাদাই সমাজে প্রধান বিষয় ছিল, যাতে করে তাদের স্বীকৃতি-অস্বীকৃতির উপরই নির্ভর করতো সমাজের অনেক বিষয়ের টিকে থাকা, না থাকা।

বণিকদের মতো সম্প্রদায়ের লোকেরাই তখন ছিল সমাজে উচ্চশ্রেণী। এ সময়টা কতো প্রাচীন তা সুনির্দিষ্ট করে বলাটা কষ্টকর হলেও দুঃসাধ্য নয়। কারণ বাংলার বণিক-ইতিহাস ও অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধির প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গেই জড়িত।

মনসামঙ্গলের বিভিন্ন অংশে চাঁদ সদাগর এবং বণিকসমাজকে 'মহাজন', 'সাহা', 'মণ্ডল', 'সদাগর' ইত্যাদির খেতাবে পরিচিত করা হয়েছে। বস্তুত ভারতীয় উপমহাদেশে (বাংলাদেশসহ) আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বণিক-ব্যবসায়ীদের বিশেষ করে 'শ্রেষ্ঠী', 'মহাজন' ইত্যাদি অভিধায় যে উল্লেখ করা হয়ে থাকে তা তাদের বিত্তের বিবেচনাতেই।

বাংলাদেশে 'মহাজন' শব্দটিতেই একটা শোষকশ্রেণীর পরিচয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। 'সুদখোর মহাজন' গ্রামবাংলায় আজো হৃদকম্পন সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের বিস্তৃত অঞ্চলে অধিকাংশ মহাজনই 'সাহা' পদবীধারী।

সেদিক থেকে, বাংলার সামাজিক জীবনের 'মহাজন', 'সাহা', 'মণ্ডল', 'সদাগর' ইত্যাদি শব্দ-বিশেষ মনসামঙ্গলের কাব্যধারায় তাৎপর্যপূর্ণভাবে রূপায়িত। এই রূপায়ণের স্বরূপ সন্ধান করা যয় নিম্নলিখিতভাবে:

ক· বিভিন্ন কাব্যে বণিকদের 'মহাজন' আখ্যা

১· 'ডিঙ্গা উজাএগ্রা আইসে কোন মহাজন।
কি জানি কি গতি হয় না জানি কারণ।।'[১৫]

২· 'ডাক দিয়া বলে তবে রোঙ্গাই ব্রাহ্মণ।।
তোমার দেশেতে আইল সাধু মহাজন।।
চম্পক নগরের রাজা চান্দ সদাগর।
বাণিজ্য করিতে আইল কহিলা সত্বর।'[১৬]

খ· বণিক-পরিচিতিতে 'সাহা' শব্দের ব্যবহার

১· 'উজানি নগরে জত সাহ সদাগর।
বিবাহ দেখিতে তারা আইলা সত্বর।।'[১৭]

২· 'বালা বোলে সুন প্রিয়া সাহের ঝিয়ারি।
তুমি আমি কৌতুকে খেলিব পাশা সারি।।'[১৮]

৩ 'সাহে বানিয়া কান্দে কোলে লইয়া ঝি।
ঘর সর্ন্য করিয়া জাও চাহিমু গিয়া কী।।
– – –
সাহে রাজা কান্দে বেউলারে কোলে তুলি।
হিঙ্গুললালি বাঘরে মোর কে করিব ধামালি।।'[১৯]

৪· 'সাহের ঘরে জন্মিয়াছে হইয়া জাতিস্মরা।
জন্মে জন্মে হবে তোমার লখিন্দর দাড়া।।'[২০]

৫· 'দুই দন্ড অছে মাত্র সাহের বানিয়ার বাড়ি।
মুক্তাসার এড়ি যায়ে সাহের বান্যার বাড়ি।।'[২১]

৬· 'সায় নামে সদাগর উজানিতে ঘর।
তাহার ঘরে কন্যা আছে পরম সুন্দর।।'[২২]

গ· 'বেনে' বা 'বানিয়া' শব্দের ব্যবহার বণিক–পরিচিতিতে

১· 'না বোলো না বোল মোরে বানিঞা দুলাল।
অধিক বলিলে বালা নহিবেক ভাল।।
– – –
সুনিঞা ক্রোধিত গন্ধ বানিঞার নন্দন।
কাচুলি চিরিঞা করে কুচের মর্দ্দন।।'[২৩]

২· 'আমার জন্ম হবে বাছো বানিয়ার ঘরে।
তোমার সহিতে বিভা হব গৌরীর বরে।।
সেই চান্দো সদাগর পৃথিবী ভিতরে।
শিব বিনে অন্য দেব না পূজে সদাগরে।' [২৪]

৩· 'হেনকালে চাঁদ বাণ্য কহে আর কথা।
যদি সে তামার কন্যা হয় পতিব্রতা।।
– – –
কুল ক্রিয়াগত আছে পুরুষে পুরুষে.
চাঁদ বান্যার কথা শূন্যা সায় বান্যা হাসে।।'[২৫]

বিপ্রদাসের কাব্যে অবশ্য বেহুলার বণিক–পিতাকে একই সঙ্গে 'সাহা' এবং 'মহাজন' এই দুই খেতাবেই সম্বোধন করা হয়েছে:

'নগরে জিজ্ঞাসা করি আইলাম তব পুরি
রাজ–আজ্ঞা জানাইল তোমা।
তুমি সাহে মহাজনে বিশেষ ভাবিয়া মনে
জে হয় করহ অঙ্গীকার'[২৬]

ঘ· সরাসরি 'সদাগর' আখ্যা দিয়েও বণিকদের সম্বোধন করা হয়েছে:

১· 'আকাশ উপরে হৈল প্রহরেক বেলা।

সাধু আইসে উজাইয়া ভাসিএগা জায় ভেলা।।
মঞ্জুসের কীর্ত্তি জেন দীপ্ত দিবাকর।
দূর হৈতে দৃষ্ট করে শঙ্খ সদাগর।।'[২৭]

২· 'সাধু বোলে আমরা না হই অন্যজন।
বাণিজ্য করিতে আইলাম কুটিশ্বরের নন্দন।।
পাটনে আমার পিতা আসিত বিস্তর।
তাহার তনয় আমি চান্দো সদাগর।।'[২৮]

৩· 'ঘট ভাঙ্গিবারে আজ্ঞা কৈল সদাগর।
জোড় হাতে বুঝাইল সকল দ্বিজবর।।'[২৯]

৪· 'মিতা কি ধন আনিয়া দিলা মোরে।
তর খৃঐীয়ার রূপে পরাণ বিদড়ে।।
ধন্য মিতা ধন্য সদাগর।
তোমার দেসে উত্তম কারিগর।।'[৩০]

৫· 'ডিঙ্গার পত্তন করে, চন্দ্রধরসদাগরে
মনেতে হইয়া আনন্দিত।'[৩১]

৬· নৌকার উপর ঘর গড়াইলসদাগর
ঘর সভ ছায়াল্য বনাতে।।'[৩২]

৭· 'তুলা লগ্নে যাত্রা করে চান্দ সদাগর।
দুর্গা দুর্গা বলি গেল, রাজার গোচর।।'[৩৩]

ঙ· মনসামঙ্গলে 'মণ্ডল' উপাধিধারী যে শ্রেণীটিকে পাওয়া যাচ্ছে, তাঁরা চাঁদ সদাগরকে মিত্র ভাবছেন, সুতরাং 'মণ্ডল'ও বণিকের আরেক খেতাব:

'বিসাদ ভাবিয়া তবে চলিল সদাগর।
সমুখে দেখিল চান্দো লক্ষিপুর নগর।।
গিরস্থের নারি আইল জল ভরিবারে।
তার ঠাই জিজ্ঞাসিল চান্দো সদাগরে।।
কোন জন বড় এথা কি নাম নগর।
তোমার ঠাঞি জিজ্ঞাসি কহত উর্ত্তর।।
– – –

চান্দোর বচনে নারির উপজ্জিল দয়া।

নহেকালে বোলে কিছু গৃহস্থের মায়া।।

লক্ষিপুর নগর হয় এহি চন্দ্রধর।

অতিতের সেবা তাঞি করে নিরন্তর।।

তাহার নিকটে তুমি করহ গমন।

— — —

কতক্ষণে হাটি চান্দো উঠিল নগরে।।

সভা করি বসিয়াছে মন্ডল চন্দ্রধর।

অতিত রূপে গেল চান্দো তাহার গোচর।।

— — —

মন্ডলে সুনিল জদি চন্দ্রধরের নাম।

মিত্র বুলিয়া কৈল দণ্ড প্রণাম।।

— — —

মন্ডল বোলে মিত্র না চিন্তয় তুমি।

এক দোলা দিয়া দেসে চালায়া দিব আমি।।'[৩৪]

উদ্ধৃতিটিতে বোঝা যায়, এ মণ্ডল, চাঁদ সদাগরকে তাঁর সম পেশার কারণেই শুধু 'মিত্র' ভাবছেন না, বিত্তের কারণেও ভাবছেন, কারণ মণ্ডলও এই নগরে সবচেয়ে 'বড়' ঘরের 'বড়' লোক হবেন, এমন ধারণা এখানে দেওয়া হয়েছে।

মনসামঙ্গলের সমসাময়িক বাংলার সামাজিক কাঠামোতে এ 'মণ্ডলদের' ভূমিকা ও স্থান ছিল সামন্ত রাজার পরে ৩ নম্বর স্তরে, ১· জায়গীরদার ২· রাজস্ব আদায়কারী ৩· গ্রামীণ চৌধুরী, মণ্ডল, মাতব্বর ইত্যাদি।'[৩৫]

এখানে ইতিহাসের সামাজিক কাঠামোর সত্যতার সঙ্গে মনসামঙ্গলে মণ্ডলদের ভূমিকা ও সামাজিক অবস্থানের সূত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে।

আর একই সঙ্গে বাংলার সামাজিক কাঠামোতে এই 'মহাজন', 'সাহা' ইত্যাদির অবস্থানও নির্দেশিত করা সম্ভব। গ্রামীণ সমাজিক কাঠামোতে মহাজন, ব্যবসায়ীদের শ্রেণীবিন্যাস করতে গিয়ে তাদের জায়গীরদার, জমিদারদের সঙ্গেই স্থান দিতে হয়। কারণ:

'মহাজনী' ব্যবসাটা একমাত্র ছিল বণিকদের হাতে। মহাজনী নিছক বৃত্তি হিসাবে একটা বর্ণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এবং সেই বর্ণ হলো বানিয়া।'[৩৬]

গৌতম ভদ্র অবশ্য 'মহাজনী'-প্রথা সমাজে আরো ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল বলে মনে করেছেন। তিনি বলেন:

> 'অষ্টাদশ শতকে বাংলাদেশেও আমরা যেসব মহাজনের নাম পাই, তাতে সোনার বেনে থেকে ব্রাহ্মণ পর্যন্ত প্রায় সকল বর্ণের ও সম্প্রদায়ের লোকেরাই আছে। -- গ্রামীণ সমাজে কিছুটা সম্পন্ন লোকই মহাজনী ব্যবসায়ে হাত দিত-এটা মনে করা খুব অযৌক্তিক না।'[৩৭]

তবে যাই হোক, মনসামঙ্গলের সমাজে আমরা একমাত্র বণিকসমাজের মধ্যেই 'মহাজনী'-প্রথার খেতাব পাচ্ছি।

মোট কথা, মনসামঙ্গলের গ্রামীণ সমাজ-কাঠামো সামন্তরাজা, রাজস্ব আদায়কারী, মহাজন ব্যবসায়ীরা সকলে ছিল একটি শোষকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং কৃষক ও মজুরসহ বাকী সকল স্তরের মানুষেরা ছিল শোষিত শ্রেণীতে যুক্ত।

উল্লেখযোগ্য যে, ম্যাকস ওয়েভারের দৃষ্টিতেও, এই বণিক-মহাজনরা ধরা পড়েছেন নিম্নোক্তভাবে:

> 'During the Period of the flowering of the cities, the Position of the guilds was quite comparable to the Position guilds occupied in the cities of the medieval occident. The guild association (the mahajan, literally, the same as popolograsso) faced on the one hand the prince, and on the other the economically dependent artisans.'[৩৮]

ওয়েভার এখানে বাংলার 'মহাজন'দের তুলনা করেছেন ইউরোপের popolograsso-এর অর্থাৎ বড়লোকদের সঙ্গে। অতঃপর তিনি 'মহাজন' নামের এ বণিকদের স্বরূপ উদঘাটন করতে গিয়ে লিখেছেন:

> 'The association of Indian guilds, the mahajan, was a force which the Princess had to take very much into account. It

was said: 'The Prince must recognize what the guilds do to the people, whether it is merciful or cruel.'[৩৯]

অন্যদিকে মনসামঙ্গলে বণিকদের যে 'সাহা' বলা হচ্ছে, বাংলার সামাজিক কাঠামোতে তারও অস্তিত্ব বিদ্যমান। 'সাহা'দের সম্পর্ক লগ্নিপুঁজির সঙ্গে। লগ্নিপুঁজি একটি সুদখোর ও শোষণমূলক ব্যবসা যার সঙ্গে বাংলার এক শ্রেণীর বণিক জড়িত ছিল। সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতিতে এ ধরনের লগ্নিপুঁজির বিকাশ সম্পর্কে কার্ল মার্কসের ইঙ্গিতের সঙ্গে বাংলাদেশের সাহা বণিকদের কার্যপদ্ধতির বেশ মিল খুঁজে পাওয়া যায়:

'Interest bearing capital. or, as we may call it in its antiquated form, usurer's capital, belongs together with its twin brother, merchant's capital, to the antediluvian forms of capital, which long precede the capitalist mode of Production and are to be found in the most diverse economic formations of society.

The existence of usurer's capital merely requires that at least a portion of products should be transformed into commodities, and that money should have developed in its various functions along with trade in commodities...

The merchant borrows money in order to make a profit with it, in order to use it as capital, that is, to expend it.' [৪০]

বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসে একমাত্র বণিক 'সাহা'রা এ ব্যবসায় যে আধিপত্য বা একচেটিয়া প্রাধান্য বিস্তার করলো সে সম্পর্কে ইরফান হবিব বলেন:

'The Hindu rich peasants and commercial castes who were religiously sanctioned to do usury .... the formation of a separate class of professional usuress who constitute a group of rural exploiters in medival Bengal may be the mark of a certain economic development of society.[৪১]

–অর্থাৎ মুসলিম সমাজের মতো কোন ধর্মীয় বাধা–নিষেধ না থাকায় উক্ত লগ্নি পুঁজির কারবার একটি ধনী হিন্দু ব্যবসায়ী জাতি–বর্ণ গোষ্ঠীর (যেমন, বাংলার সাহাদের) সহজেই করায়ত্ত হয়। এভাবে বাংলার তৎকালীন গ্রামীণ সমাজ–কাঠামোয় একটি পৃথক পেশাদার সুদখোর শ্রেণীর বিকাশ ঘটে।

বাংলায় সামাজিক ইতিহাসে এভাবে এ বণিক মহাজন–সাহাদের সম্পর্কে যে রকম বিবরণ পাওয়া যায়, মনসামঙ্গলেও তার ছায়া আছে। সরাসরি চাঁদ সদাগরের শাসকসুলভ ও শোষণমূলক আচরণ এ পর্যায়ে আলোচনা না করেও দেখা যাবে বিচ্ছিন্নভাবে কবিদের মন্তব্যে বা অন্যান্য প্রসঙ্গে এই বণিকদের সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে।

মনসামঙ্গলের অন্যতম কবি নারায়ণদেবের কাব্যে সরাসরি বণিকদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে:

১· 'জত জাতির মৈধ্যে বানিয়া অধম জাতি।
লাজ লর্জা দয়া ধর্ম্ম নাহি এক রতি।।
আছুক আমার কার্য্য হরে মিত্রের ধন।
মায়ের কানের সোনার দিগে সদারায় করে মন।।'[৪২]

২· 'ধর্ম সাস্ত্র নাহি বুজ বানিয়া জে মুঢ়।।
— — —
দেবগুরু ব্রাহ্মণ আর মাতা পিতা।
বানিয়ার ঠাই নাহি এ থেকে মান্যতা।।
কাক হন্তে সেআন জে বানিয়া ছাওয়াল।
বানিয়া হন্তে ধুণ্ড জেই তারে দেই পান।।
সোনা রোপা জরি কতে এই আসা তোর
তোমি ছার জনিয়াছে কোলের খাখার।।[৪৩]

৩· 'বানিয়ার পুত্র তুমি লহ মান্য জন।
বড়াই করিস বেটা লঘুর লক্ষণ।।[৪৪]

অন্তবিভূতির কাব্যেও এ চেতনার ছায়া আছে, যদিও তা মনসারই ভাষ্যে:

১· 'বানিয়া দুরাচার করিস অহঙ্কার
এত দুঃখ পাসরি কিমতে
— — — —
আমি তোকে কহি সুন বানিয়া দুর্জন
অবশ্য তোকে করিব নৈরাশ।।

বানিয়া বর্ব্বর বসিল দুরাক্ষর
কহিস আমি শঙ্করের দাস।'[৪৫]

২· 'বানিয়া সে দুরাচার করিস কি অহঙ্কার
এতো দুঃখ খণ্ডিবে কেমনে।
সভাকার বিদ্যমান করিলি জে অপমান
সেহ দুঃখ জাগিছে হৃদয়।
এ যে তোরে কহিসুন বানিঞা জে দুর্জ্জন
অবশ্য করিব নিরাশ্রয়।।
বানিয়ারে বর্ব্বর বোলিস দুবাক্ষর
কহিস আমি শঙ্করের দাস।'[৪৬]

এ উপমহাদেশের সামাজিক– কাঠামোতে এই বণিকশ্রেণীর উদ্ভব, প্রতিষ্ঠা এবং বিকাশের ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন। সমাজবিজ্ঞানীগণ মনে করেন, ছয় শতক থেকেই বাংলার গাঙ্গেয় উপত্যকার সমাজকাঠামোয় যে বিত্তবানশ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল,তারা ছিল বণিক। দামোদর কোশাম্বী এই সময়কার বিত্তবান বণিকদের ভূমিকা প্রসঙ্গে বলেন:

'The traders had become so wealthy that the most important person in an eastern town was generally 'sresti'. The term not known earlier, is derived from the word for 'superior' or 'pre-eminent'. The 'sresti', was actually a financiar or banker,some times the head of a trade guild. Even absolute desptic kings treated these 'srestis' with respect, though they had no direct voice in Politics.'[৪৭]

–আর বর্ণনির্ভর বৃত্তির দেশ বাংলাদেশে এ বণিকশ্রেণীর সুযোগ–সম্মান বৃদ্ধির অর্থ সমাজের একটি বিশেষ বর্ণেরই অর্থনৈতিক তথা সামাজিক জয়যাত্রার ইতিহাস।'[৪৮]

ভারতবর্ষের ইতিহাসে এ বণিকদের অস্তিত্বের সংবাদ আরো প্রাচীন বলে অনুমিত হয়। ঋগ্বেদে 'পণি'[৪৯] নামক একটি শব্দ পাওয়া যাচ্ছে ('পণি থেকে পণ্য' এবং পরে 'বণিক' শব্দের উৎপত্তি)। এখানে আর্যরা পূর্বাঞ্চলের একটি শ্রেণীকে 'পণি' বলে গালি দিচ্ছে। বৈদিক সাহিত্যের সাক্ষ্য থেকে বলা যায় যে:

'পণিরা ধনী এবং উদ্যমী বণিক শ্রেণী ছিল– এদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল লাভ; তা সে ব্যবসায়েই হোক বা ঋণ দিয়ে হোক। এদের ঋণদাতাকে মহাজন বা বেকনাট বলা হয়েছে।'[৫০]

ঋগ্বেদে অবশ্য সরাসরি 'বণিক' শব্দটিও পাওয়া যায়। সেখানে এক যায়গায় বলা হচ্ছে, 'ইন্দ্র বণিকের ন্যায় ধন অপহরণ করিতে গমন করেন এবং মনুষ্যের শোভাবিধানকারী সেই ধন যজমানকে প্রদান করেন।'[৫১]

বস্তুতপক্ষে, আনুমানিক সাড়ে তিন হাজার বছর আগে বাঙালীরা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচিত ছিল। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বণিকদের বাংলাদেশেও নিবাস ছিল, প্রসঙ্গান্তরে এ কথাও ভেবে নেয়া যায়। দুই দেশের বণিকদের মধ্যে বিয়ে ও অন্যান্য আত্মীয়তার সম্পর্কও স্থাপিত হয়ে থাকতে পারে। চেহারা দেখে মনে হয় বাংলার সুবর্ণ বণিকসম্প্রদায় তাদেরই বংশধর।[৫২]

নানা উত্থান ও পতনের মধ্যেও এই বণিকদের প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক আভিজাত্য বাংলার পাল আমল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেন আমলে এসে বণিকদের প্রভাব প্রতিপত্তি নানা কারণে কমে যায়। কারণ তখন রাজশক্তির প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তি ও সামাজিক মর্যাদা বাড়তে শুরু করেছে। 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' মতে এই সময় সুবর্ণ বণিকেরা সামাজিক শ্রেণী হিসাবে সৎ শূদ্র অর্থাৎ মধ্যম সঙ্কর জাত হয়ে পড়েছে। এর কারণ হিসাবে বলা হয়েছে, বল্লভানন্দ নামে একজন প্রসিদ্ধ সুবর্ণ বণিক রাজা বল্লাল সেনকে অর্থ সরবরাহ করতে অসম্মত হওয়ায় বল্লাল সেন তাদের (সকল বণিককে) অবনমিত করে রেখেছিলেন। ত, না হলে হয়তো বণিকরা উত্তম সঙ্কেরেই স্থান পেত।[৫৩] অবশ্য বণিকদের সামাজিক মর্যাদার ওঠা–নামায় অর্থনৈতিক ভারসাম্যের বিষয়টিও ছিল। ৭ম শতক পর্যন্ত ব্যবসা–বাণিজ্যের সমৃদ্ধির সঙ্গেই বণিকদের উন্নত মর্যাদা ও প্রতিপত্তি এবং ৮ম শতক থেকে দ্রুত ব্যবসা–বাণিজ্যের প্রসার কমতে থাকলে বণিকদের আধিপত্যও কমতে থাকে, মর্যাদার বিষয়টি তাই অনেক ক্ষেত্রে ছিল সামাজিক–অর্থনৈতিকও। কারণ বাংলার সামাজিক ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে, ৮ম শতকের পর কৃষিনির্ভর অর্থনীতিরও প্রসার ঘটছে এবং অনেক বণিককেও দেখি সামন্তরাজার ভূমিকা গ্রহণ করতে। আলবেরুণী তাঁর বর্ণনায় বৈশ্যদের কর্মপরিধির যে উল্লেখ করেছেন, তাতে এ কৃষি–কর্ম, ভূমিকর্ষণসহ ব্রাহ্মণের সেবার কথা রয়েছে।[৫৪]

অন্যদিকে, মধ্যযুগেও দেখা যায়, বাংলার অর্থনৈতিক, সামাজিক ইতিহাসে এ সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক ও জম্বুলবণিকের একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। যদিও পূর্বের তুলনায় বণিকদের প্রতিপত্তি আর তখন নিরঙ্কুশ ছিল না, কিন্তু এরপরেও বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে বণিকদের ভূমিকা ছিল। মধ্যযুগের বণিকদের এ অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ বলেন:

> 'প্রধানতঃ নদ-নদীর তীরে জলপথে চলাচলের সুবিধার দিকে দৃষ্টি রেখেই বণিকরা বসতি স্থাপন করতেন।.... তারা মধ্যে অনেক বসতি ক্রমে বাণিজ্য প্রধান কেন্দ্ররূপে 'নগর' বলে পরিচিত হয়েছিল। কতকটা মধ্যযুগীয় 'গিল্ডের' মতো তার দলবদ্ধবাবে 'সমাজ'ও গঠন করেছিলেন।-.. রাষ্ট্রদুর্যোগে অথবা নদ-নদীর গতি পরিবর্তনের ফলে বাণিজ্যিক বিপর্যয়ে এই ধরনের সমাজ ভেঙ্গে গিয়েছে, আবার নতুন করে গড়ে উঠেছে।' [৫৫]

মনসামঙ্গলের কাব্যধারা যত্ন সহকারে লক্ষ্য করলে আমরা সমাজ বিশ্লেষকদের এরূপ মন্তব্যের যাথার্থ্য খুঁজে পাই। চাঁদ সদাগরের নগর, বেহুলার নগর, হাসানের নগর ইত্যাদি নগর বর্ণনার পর্যালোচনায়ও বাংলার তুর্কী আগমন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ের বাণিজ্য ধারার রূপায়ণ লক্ষ্যযোগ্য। মনসামঙ্গল কাব্যধারা বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যের এই দুই সময়কেই অত্যন্ত সযত্নে ধরে রেখেছে। সেদিক থেকে বলা চলে, মধুকর, দুর্গাবর, শঙ্খচূড়, চন্দ্রপাল, ছোটমুটি, গুয়ারেখী, নাটশালা প্রর্ভতি সদাগরী নৌকার বর্ণনা নিছক কবি-কল্পনা নয়। এখানে লুকিয়ে রয়েছে হাজার হাজার বছরের বাংলার সামাজিক-অর্থনৈতিক ইতিহাসের দলিল।

চাঁদ সদাগর পরিচয়

বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসে বিশেষ করে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় বণিকসমাজের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঐতিহাসিক বিচারে এ ভূমিকার উত্থান-পতন আছে হয়তো, কিন্তু সমাজের সকল প্রকার পরিস্থিতিতেও বণিকরা তাদের গুরুত্ব হারায়নি। কারণ:

> '— সাক্ষ্য প্রমাণ দেখিলে সহজেই মনে হয়, প্রাচীন বাংলার সমৃদ্ধি যাহা ছিল, তাহা বহুলাংশে নির্ভর করিত ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর। তাহা ছাড়া পঞ্চম ও অষ্টম শতক পর্যন্ত দেখিতেছি, ভূমিদান-বিক্রয়ের দলিলগুলিতে স্থানীয় অধিকরণে যাঁহাদের আহ্বান করা হইতেছে সেই পাঁচ জনের মধ্যে

দুইজন তো রাজ কর্মচারী–বিষয়পতি স্বয়ং এবং প্রথম কায়স্থ, বা জ্যেষ্ঠ কায়স্থ; বাকী তিন জনের মধ্যে দুইজন ব্যবসা–বাণিজ্যের প্রতিনিধি– নগর শ্রেষ্ঠী এবং প্রথম সার্থবাহ; অবশিষ্ট যিনি রহিলেন, তিনি প্রথম কুলিক অর্থাৎ শিল্পীগোষ্ঠীর প্রতিনিধি। তাহা হইলে দেখিতেছি, রাষ্ট্রেও কতকটা আধিপত্য এই বণিক ও ব্যবসায়ীরাই করিতেছেন। ব্যবসা–বাণিজ্যের ফলে এই সব শ্রেষ্ঠী ও বণিকদের হাতে যে অর্থাগম হইত, তাহার ফলেই ইহারা রাষ্ট্রে আধিপত্য লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।' [৫৬]

মনসামঙ্গলের বিভিন্ন ঘটনা–সংঘাত, কাহিনীর বিন্যাস ও বিকাশে বাংলার সামাজিক ইতিহাসের এই ধারার প্রতিফলন ঘটেছে। মনসামঙ্গল বাক্যধারার মূল অংশ জুড়ে রয়েছে বণিকদের কথা, গাঁথা, তাদের আশা–আকাংক্ষা, ধ্যান–ধারণা ও আধিপত্যের বিবরণ। এই বণিককূলের শিরোমণি চাঁদ সদাগর, মনসামঙ্গলের বিবাদমান পক্ষগুলোর অন্যতম প্রধান চরিত্র এবং এক পক্ষের নেতা।

কাব্যসমূহে চাঁদ সদাগরের যে পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে, তা প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার বণিকসমাজের পরিচয় পরিস্ফুট করেঃ

'চম্পক নগরে ঘর চাঁদো অধিকারী
গন্ধ বণিকের কূলে জন্ম তাহারি।
রাজ চক্রবর্ত্তী রাজা রাজ্য বহদূর
কূলে শীলে ধনে জনে বলে মহীশূর।
কুবের সমান ধন রত্ন মণিময়।
অসংখ্য অমূল্য নিধি দীপ্ত অতিশয়।
সেনাপতি মহারথী সৈন্য অগণন।
কুঞ্জরে প্রচুর অশ্ব করয়ে গর্জন।
তন্ত্রি–মন্ত্রি–পাত্রগণ আমত্য বান্ধব
পুরবাসী দাসদাসী কত আছে সব।' [৫৭]

এখানে চাঁদ সদাগরের বংশ–পরিচয়কে তুলে ধরছে 'গন্ধ বণিকের কূলে' বাক্য দ্বারা, তাঁর সামন্ত পরিচয়কে উদ্ভাসিত করেছে, 'রাজ চক্রবর্ত্তী' এবং 'সেনাপতি মহারথী' বাক্য দ্বারা, এ ছাড়াও সামন্ত রাজার 'দাস–দাসী পুরবাসী', 'তন্ত্রি–মন্ত্রি' শব্দও সামন্ত রাজার পরিচয়কে বিধৃত করে। একই সঙ্গে 'কুবের সমান ধন' বাক্যের মধ্য দিয়ে বিত্তশালী বণিকগোষ্ঠীর শ্রেণী অবস্থানকে চিহ্নিত করেছে। এই কয়েকটি মাত্র বাক্যের মধ্য দিয়ে প্রাচীন ও

মধ্যযুগের বাংলার সামাজিক–রাজনৈতিক জীবনে বণিক আধিপত্যের স্বীকৃতি কাব্যে রূপায়িত হয়েছে। অন্যান্য কাব্যেও তাঁর ব্যতিক্রম দেখি না।

চাঁদ সদাগরের জন্মের পূর্বসূত্র ধরে বংশের একটি বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন দ্বিজ বংশীদাস:

'বৈসে চম্পক দেশে গন্ধ মাণিক্য বংশে
ধনঞ্জয় সুত কোটিশ্বর।'[৫৮]

এই কোটিশ্বরের ঘরে চাঁদ সদাগর চন্দ্রধর নামে পুনর্জন্ম লাভ করেন। এই পুনর্জন্মের পূর্বে চাঁদের পরিচয় ছিল ভিন্ন।

চাঁদ সদাগরের বংশ পরিচয় সূত্রে পূর্ব পুরুষদের বিবরণে বলা হয়েছে যে, চাঁদ সদাগরের পূর্ব পুরুষরাও চাঁদের মতো বর্হিবাণিজ্যে বের হয়েছিলেন। যে পথে চাঁদ এসেছেন বাণিজ্য করতে, সে পথে তাঁর পিতাও এসেছিলেন এবং প্রচুর বিত্ত ও সম্পদের মালিক হয়ে ফিরেছিলেন:

'ধনাই বোলে পাটনের কথা শুন চন্দ্রধর
মৃর্দ্দা মাঝি আর সতেক গাবর।।
পূর্বে বাণিজ্য করিছি তোমার বাপের সনে।
একবার আসিছিলাম দক্ষিণ পাটনে।
– – – –
তোমার বাপ আছিল বণিক ভাস্কর।
এহি রার্য্যের ধনে তাঁর নাম হইল কুটীস্বর।।[৫৯]

এরকম পূর্ব পুরুষের ধনাঢ্যশীলতা ও বিত্তের পরিচয় তুলে ধরে চাঁদ সদাগরের শ্রেণীকে চিহ্নিত করা হয়েছে তন্ত্রবিভূতির কাব্যে।

বিজয় গুপ্তের কাব্যে চাঁদ সদাগরের পরিচয় সূত্রে বলা হয়েছে:

'সবে শুনিছ রাজ্যে চম্পক নগর।
তথাতে বসতি করে চান্দো সদাগর।[৬০]

অথবা—

'আমি সাধু চন্দ্রধর রাজ্যের অধিকারী।'[৬১]

চাঁদ নিজেই শ্রেণীচেতনা স্পষ্ট করে:

'ছোটজন নহে চান্দ, রাজ ভোগে ভোলা।'[৬২]

মনসামঙ্গল কাব্যধারায় বিবাদমান পক্ষের একটি দলের নেতা চাঁদ সদাগর পেশায় বণিক, কিন্তু মতাদর্শে ব্রাহ্মণ্য- আদর্শের প্রতিভূ। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, চাঁদ সদাগর দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে বুঝি মনসারই ত্রাস; প্রকৃতপক্ষে, মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদ সদাগর চরিত্রটি প্রবল প্রতাপশালী এক ব্যক্তিত্ব, যার ভয়ে ও সন্ত্রাসে সমাজমানুষ ঘরে-বাইরে সর্বত্রই তটস্থ। চাঁদ সদাগর নিজে এবং তার পোষ্য বাহিনী সাধারণ মানুষের কাছে ত্রাস সৃষ্টির প্রতীক হিসাবে সর্বত্র বিরাজমান।

অন্তবিভূতির বাক্যে দেখি, চাঁদ সদাগর নিজে তার বাহিনী নিয়ে হাটে- বাজারে সাধারণ মানুষের উপর নির্যাতন চালাচ্ছেন। টাকার জোরে বাহুবলে জোর করে হাট থেকে জেলে রমণীর মাছ কিনে নিতে চায় চাঁদ সদাগরের লাঠিয়াল শিষ্য 'নেঙ্গা', কিন্তু জেলেনী টাকার বিনিময়েও এদের কাছে মাছ বিক্রি করতে চায় না:

'নও বুড়ি কুড়ি নেঙ্গা কোছাতে করিঞা।
শ্রীকস্পার হাটে নেঙ্গা উত্তরিল গিঞা ।।
নও কড়ি বুড়ি হীরার পসারে ফেলিঞা।
নও পুঞ্জি মৎস্য নেঙ্গা নইল তুলিঞা।
জ্বলন্ত আনলে জেন দর্শাইল তৈল।
নেঙ্গাকে দেখিঞা হীরা ক্রোধে জল্যা গেল ।। ৬৩

এক জেলে-রমণী ঘৃণাভরে টাকা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মাছ ফিরিয়া নিল। কিন্তু প্রতাপী চাঁদের লাঠিয়াল কিন্তু এটা মেনে নিতে পারলো না। সাধারণ জেলে-রমণীর এতো তেজ। সরাসরি এসে শায়েস্তার আবেদন জানাল সামন্তরাজা চাঁদ সদাগরের কাছে। এবং চাঁদ সদাগর শুনেই:

'ই বোল শুনিয়া ক্রোধ হৈল সদাগরে।
সাজিল সদাগর হীরাকে মারিবারে ।।
সাজ সাজ করি চান্দো ডাকে ঘন ঘন ।
ছয় পুত্র সাজ হৈল নানা আভরণ ।।
পাত্র মিত্র সাজিলেন চাকর নফর ।
আর জত শিষ্য সাজে বিবিধ প্রকার ।।
— — —
হীরারো মারিতে চান্দো হৈল আগুসার।' ৬৪

সাধারণ একজন গরীব নিম্নশ্রেণীর জেলে-রমণীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য উচ্চশ্রেণীর এই বাগাড়ম্বর হাসির খোরাক জোগালেও ঘটনাটি ছিল খুবই ভয়াবহ। কারণ চাঁদ সদাগর:

'হস্তীর মাহুত বোলি ডাকিতে লাগিল ।।
হীরাকে ফেলাও তুমি হস্তী ঠেলা দিএগ।
নেঙ্গা পুত্রেক চান্দো বোলে ডাক দিএগ।।
চান্দো বোলে নেঙ্গা বাছা মোর বাক্যধর।
জেন তোর মনে লাগে তেন শাস্তি কর ।।' ৬৫

এ শুধু অমানবিক নয়, অপরিণামদর্শীও। একজন সামন্তরাজা সামান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে একজন গরীব প্রজার বিরুদ্ধে লাঠিয়াল বাহিনী লেলিয়ে দিয়ে বলছে, মনে যেমন ইচ্ছে ধরে তেমন শাস্তিই যেন তাকে দেয়। ফলে যা হবার তাই হল:

'একে চাহ নেঙ্গা দুয়জে আজ্ঞা পায়।
হাটুআতে মাথা দিএগ দুহাতে কিলায় ।।' ৬৬

এবং শারীরিক প্রহারেই ঘটনার শেষ হল না, চাঁদ সদাগর নিজে গরীব জেলে-রমণীর সকল বিকিনীও লুটপাট করে নিলেন:

'কিল খায়া হীরা তবে হইলা কাকর।
লুটিএগ নইল সাধু হীরার পসার ।।' ৬৭

সমাজের এমন নৈরাজ্যকর অবস্থায় সাধারণ মানুষের আর কিছুই করার থাকে না, অন্ততঃ যখন সমাজপতি প্রজা নির্যাতনে নিজেই নেতৃত্ব দেন। সুতরাং জেলে-রমণী হীরারও কোনো বিকল্প পথ ছিল না। এ অবস্থায় নিরুপায়-নিঃসহায় মানুষের চিরন্তন একটাই পথ থাকে- খোদার কাছে বিচার দিয়ে রাখা। (আজো মজলুম জনতা এ পথকেই বেছে নেয় মনের শান্তি পাওয়ার ইচ্ছায়)। নির্যাতিতা জেলে-রমণী সেই পথই বেছে নিল দেবীর চরণে:

'কান্দিএগ বোলেন হীরা দেবীর গোচরে।
কি কার্য করিলে মা মোকে দিএগ বরে ।।
শ্রী কলার হাটে গেলাম মৎস্য বেচিবারে।
কিলাএগ পাঞ্জর সাধু ভাঙ্গিল আমারে ।।' ৬৮

জেলে–কৈবর্তশ্রেণীর মতো নিম্নবিত্ত মানুষের উপর বণিকসমাজ তথা চাঁদ সদাগরের নির্যাতনের সাক্ষ্য আরো বিভিন্ন কাব্যে আছে। বাণিজ্যযাত্রায় নদীর পাড়ে মনসার–পূজারত কৈবর্তের ধর্ম–পালনের অধিকার পর্যন্ত খর্ব হয়ে পড়েছিল সেদিন চাঁদ সদাগরের হাতে:

'আচম্বিতে দেখে পুরী জলের ভিতর ।।
মনসার পুরী হেন ততক্ষণে জানি।
এমন অপূর্ব পুরী করিয়াছে কানি।।
তথাতে কি রক্ত দেখি করি নানা সন্ধি।
চারিদিগ বেড়িয়ে কৈবর্ত করে বন্দী ।।
চান্দ বোলে কৈবর্ত্ত শুন মোর কথা।
ধূপে দীপে পূজা কর কোন দেবতা ।।
কোন দেব পূজা কর সমুদ্রের জলে।
খাসা ইনাম দিব [তোমা] সত্য কহো মোরে ।।
ইনামের কথা শুনি কৈবর্ত্ত হরষিত ।
জোড় হস্ত করি কহে চান্দের বিধিত ।।
মনসার পুরী এহি শোন মহাশয় ।
ধূপ দীপ দিয়া পূজি মনসার পায় ।।
কৈবর্ত্তের মুখে বার্ত্তা পাইয়া সদাগর ।
কোপে রাঙ্গা দুই আঁখি কাঁপে থর থর ।।
ধর ধর বলিয়া চান্দো তখনে রুষিল ।
চোপারে চাপরে তার গাল ফুলাইল ।।
....
জর্জ্জর হইল কৈবর্ত্ত প্রহারের ঘায়।
লাজ পাইয়া ভয়ে ক্রমে ধরে ধনার পায় ।।
ক্রুদ্ধ হইয়া চান্দো ডাকে উচ্চ রায়ে ।
হাতে গলে কৈবর্ত্ত বান্দিয়া তুলে নায়ে ।।' ৬৯

চাঁদ সদাগরের এ ত্রাসের রাজত্ব সর্বত্রই বিরাজিত ছিল। যখন সাধারণ মানুষ কম্পিত হয়ে পালিয়ে যেতে চায়, তখন বোঝা যায় কি অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছিল চাঁদ সদাগর এবং তার অনুচরবৃন্দ।

এ ধরনের একটি ঘটনা দেখা যায়, মনসাদেবীর পূজার ঘরে বাদ্যকররা যখন একমনে আনন্দ করছিল, তখন চাঁদের আগমন ঘটলে:

'জতো বাদ্যকরগণে সাধু বোলে ডাক দিএা।
কানীর মন্ডপে তোরা বাদ্য বাজাও কি লাগিএা।।
আপন ভালাই জদি চাও বাদ্যকর।।
কানীর মণ্ডপ ভাঙ্গি জাহো নিজ ঘর।।
এতো সুনি বাদ্যকর ত্রাসিত হইল।
আপন আপন গৃহে পলাইয়া গেল।।' ৭০

লক্ষণীয় এ সমাজপতি, সাধারণের ধর্ম পালনের অধিকারই কেড়ে নিয়েছিলেন শুধু তাই নয়, সব ধরনের দেবীর পূজার ঘর পর্যন্ত ভেঙ্গে ছেড়েছেন, উপরি-উক্ত উদ্ধৃতি তারই প্রমাণ বহন করছে।

একজন সাধারণ নিম্নশ্রেণীর মানুষ-কামার, সেও সবংশে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করছে চাঁদ সদাগরের হাতে:

'কামার বোলেন মা চান্দো রাজ্যে ঘর।
দেখিল সবংশে কাটে চান্দো সদাগর।' ৭১

সাধারণ একজন গণক-জ্যোতিষী তাকেও চাঁদ সদাগর বন্দী করে মাথা মুড়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে একটি সামান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে:

'ক্রোধে বোলে বানিয়া দৈবজ্ঞ বন্দি কর।
জাবৎ না আসি আমি চাম্পালি নগর।।
মিথ্যা হৈলে মাথা মূড়ি ফিরাইব নাম।' ৭২

স্ত্রী সোনেকার কাছেও চাঁদ সদাগর সন্ত্রাসের প্রতীক। বাইরের মতো ঘরেও চাঁদের নির্যাতনে সকলে তটস্থ:

'বানিয়ার গর্জনে ত্রাসিতে সোনকার মনে
ডিঙ্গাতে চড়িতে চান্দো জায়।' ৭৩

চাঁদ সদাগরের এসব আচরণ-নিবর্তনের ত্রাস ঘরে-বাইরের পরও ছিল তার স্বয়ং খাস-দরবারেই। চাঁদের ক্রোধে কম্পিত হয়ে তাঁর পাত্র-মিত্র সভাসদরাও পালিয়ে বেড়ায়:

'ক্রোধ করি বোলে তবে চান্দো সদাগর।
পাত্র মিত্র পলাইএা গেল সভে ঘর।।' ৭৪

এ পালানোর দৃশ্য দেখি পর- দেশেও। চাঁদ সদাগর সৈন্য নিয়ে বিদেশে গেলে তাঁদের ভয়ে দলে দলে সাধারণ মানুষ পালিয়ে যায়:

'সৈন্য সামন্ত সাজি চলে চান্দো সদাগর।
হরসাধু মণ্ডলের দেশে হৈল চমৎকার।।
পলায় দেশের লোক সৈন্যের তরাসে।
কেহ বোলে কোন রাজা নিতে আইল দেশে।।
পালাও পালাও বলি হৈল গণ্ডোগোল।
স্ত্রী পুরুষ পলাইল হৈএগ্রা উত্তরোল।।
বৃদ্ধ আবল পালায় যুবক ছাওল।
— — —
কোচ শূদ্র পলায় বনে এড়ি হাল।।
— — —
ভাট ভিখারী পলায় পলায় গণকজাতি।
কোলের ছাওল ছাড়ি পলায় কাচা পোয়াতি।।'[৭৫]

বোঝা যায়, এভাবে সাধারণ মানুষের দল সময়-সময়ই নির্যাতন আর নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতো। চাঁদ সদাগরের লাঠিয়াল বাহিনী, তাঁর সৈন্যদল এবং তিনি নিজে যেভাবে কাব্যে সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন তাতে নিম্নশ্রেণীর মানুষের দুর্গতির আর শেষ ছিল না।

গ্রামীণ মানুষের মনে চাঁদ সদাগর সম্পর্কিত এ ভীতি সব সময়ই কাজ করতো- এমন আভাস কাব্যসমূহে বিদ্যমান। পুত্র লখিন্দর বিয়ের রাতে মারা যাবে এমন আশঙ্কা থেকে গ্রামের কোনো পরিবারই রাজী ছিল না চাঁদ সদাগরের সঙ্গে আত্মীয়তা করতে। কিন্তু চাঁদ সদাগর যে প্রকৃতির মানুষ তাতে জোর করে কন্যার পিতাদের বাধ্য করতে পারে- এমন আশঙ্কায় সাধারণেরা দেশান্তরী হয়েছে:

'বসিয়া বণিককূল আপনার পুরি
পুত্র জায়া লইয়া সভে অনুমান করি।
বিবা-রাত্রে লখাই মরিব সর্পাঘাতে
দেখিয়া দুহিতা রাণ্ডি করিব কেমতে।
অবস্থিতা কুমারী আছিল জার ঘরে

পুরিজন লইয়া পলায় দেশান্তরে।' [৭৬]

চাঁদ সদাগরের দেওয়া নির্দেশ পালনে একটু বিলম্ব হলেই প্রাণ যেতে পারে এমন শঙ্কা জেগেছে প্রজাকূলের মাঝে। বিপ্রদাসের কাব্যে, চাঁদ সদাগরের পিতার মৃত্যুর শেষকৃত্যানুষ্ঠানে জেলেদের মাছ ধরে দেওয়ার হুকুম হয়েছিল। কিন্তু মাছ না পাওয়াতে জেলের প্রাণ যাওয়ার শঙ্কায় অস্থির হতে দেখি। এ শঙ্কা থেকেই জেলে দল উচ্চারণ করেছে, 'বিলম্ব হইলে রাজা বধিব পরানে।।'

চাঁদ সদাগরের এ ধরনের অত্যাচারী মনোভাবের পরিচয় আরো রয়েছে অন্যান্য কবির কাব্যেও। বাণিজ্য–যাত্রায় সাগরে পৌছে দুর্যোগের সম্মুখীন হওযার পর সহযাত্রী একজন সাধারণ কর্মচারী, মনসার সঙ্গে দুর্ব্যবহারের কারণেই এ 'দুর্গতি'– মন্তব্য করলে চাঁদ সদাগর তাকে যে শাস্তি প্রদান করেন, তা সভ্য সমাজের বাইরের ঘটনা:

'সুনিঞা মালুর বানি ক্রোধ চান্দর হইল পুনি
বোলে বেটাক চুলে ধরি আন।
এক বুলিতে সহস্র ধাইল চুলে ধরি লয়া আইল
নায়ে পাড়ি কাটিল দুই কান।।' [৭৭]

শুধু চাঁদ সদাগর নয়, তাঁর সমর্থক বিভিন্ন গোষ্ঠীও এসব জুলুম ও নির্যাতনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। এর মধ্যে বণিকগোষ্ঠীর সমর্থক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণগোষ্ঠীর ধন্বন্তরী ওঝা ও তার শিষ্যরাও ছিল। ক্ষেমানন্দের কাব্যে দেখি একজন সাধারণ গোয়ালিনীর দধি লুট করে খেতেও তাদের বাধেনি:

'এত শুনি ধন্বন্তরি চলি গেল নিজপুরী
দধি কিনিবারে নাহি সাধ।
ছয় কুড়ি শিষ তার ঘরে নাহি গেল আর
যেন মতে পড়িব প্রমাদ।।
— —
ছয় কুড়ি ছয় ভাই যুক্তি করে এক ঠাঁই
অবশ্য খাইব আজি দধি।
কাহার সঙ্কোচ ভাই পসরা লুটিয়া খাই
বুঝাইলে নাহি দেয় যদি।।

এবং লজ্জা, সঙ্কোচ, ভয়–ভীতি ত্যাগ করে এরপর শুরু হলো শিষ্যদের দধি লুট:

— — —

'একজন নিল তারা একখানি দই।
গোয়ালিনী বলে বাপু কড়িগুলি কই।।
— — —
ছ'কুড়ি ছ'জন তারা করে কাণাকানি।
একজনে খাব ভাই দধি এক খানি।।
দধি লএ চল মোরা যাই পলাইয়া।
গোয়ালিনী পাছে সে গোহারি করে গিয়া।।
একজন লয়্যা যায় দধি এক খানি।।
কপট বচন করি কান্দে গোয়ালিনী।।'[৭৮]

বোঝা যায়, একজন সাধারণ গোয়ালিনীর পসারেরও নিরাপত্তা ছিল না এদের হাতে। সমাজে নিরুপায় নিঃসহায় মানুষ এতো বেশী পরিমাণ অসহায় হয়ে পড়েছিলো সেদিন, মনসামঙ্গল কাব্য তারই একটি উৎকৃষ্ট সামাজিক দলিল।

এমন লুটপাটের ঘটনায় সরাসরি চাঁদ সদাগরও জড়িত। চাঁদ সদাগর বরং আরো গুরুতর লুটপাটের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। সমাজ-ধর্মের কঠোর পুরুষ তিনি। তাঁর আচরণ ও ভাবান্তরে মনে হয় অসামান্য তিনি, কারণ কোনো কিছুর বিনিময়েই যিনি তাঁর মতাদর্শ ব্রাহ্মণ্য আচার-আচরণের প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো অনার্য-লোকায়ত সংস্কৃতিকে স্বীকৃতি দেবেন না, এহেন প্রতাপশালী চাঁদ সদাগরকে দেখি দেবতার ঘর মন্দিরের ধন লুটপাট করে নিয়ে যাচ্ছেন। এতে একটুও তার বিবেকে বাধছে না, 'মন্দিরের ... ডিঙ্গা কৈলা ভরা।'

এভাবে চাঁদ সদাগর শুধু মন্দিরের ধন লুটের সঙ্গেই জড়িত হয়ে পড়লেন না, মনসার সঙ্গে দ্বন্দ্বে সে সরাসরি সংঘর্ষের দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়ে নিলো। চাঁদ সদাগর শুধু মনসার বিরোধিতাই করলো না, তার মন্দির আক্রমণ করলো এবং মন্দিরের ধন লুট করে নিয়ে সংঘাতের সৃষ্টি করলো। উচ্চ-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ্য আদর্শের প্রতিভূ এ চাঁদ সদাগর নিজেকে দেবতার প্রতিনিধি ভাবতো, কখনো কখনো দেব-সমতুলও। মনসাকে একবার চাঁদ সদাগর তাকেই (সদাগরকে) উল্টো পূজো করার প্রস্তাব দিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে দেবতা ও ধর্মের নাম ভেঙে শাসন ও শোষণ ছিল প্রাচীন ও মধ্যযুগের অতি সাধারণ একটি ঘটনা।

কিন্তু উচ্চ-শ্রেণীর এ কৌশল যেদিন ভেঙে যায়, সেদিন অত্যন্ত নির্মমভাবে ভেঙ্গে যায়। চাঁদ সদাগরের পরাজয়ের গ্লানি তাই এতো বেশী চরম আকার ধারণ করেছিল। নিম্নশ্রেণীর মনসার ও তার সমর্থকদের বিজয়ের দিনে চাঁদ সদাগর স্বীকৃতিতে রাজী হয়ে সুবর্ণের ঘট আনার প্রস্তুতি নিলে মনসা বললো, সুবর্ণের ঘট নয়, ঐ জালু-মালুদের বাড়ী থেকেই ঘট এনে পূজো করতেহবে।[৭৯]

যে নিম্নশ্রেণীর মানুষের হাতে পানি খেলে জাত যায়, যাদের ছোঁয়াতে জাত নষ্ট হয় বলে চাঁদ সদাগর এতোকাল যাদের ঘৃণা করেছে, নির্যাতন চালিয়েছে, সেই নিম্নশ্রেণীর মানুষের বাড়ী থেকে তাদের ব্যবহার করা পাত্র এনে অবশেষে চাঁদ সদাগরকে মনসার পূজো করতে হলো বা সমাজে মনসাকে স্বীকৃতি দিতে হলো। চাঁদ সদাগরের মতো ব্রাহ্মণ্য-আশ্রিত মতাদর্শের প্রতিভূ উচ্চ-শ্রেণীর মানুষের ট্যাজেডী এখানেই। শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাসে এ ঘটনা অত্যন্ত নির্মম, চরম প্রতিশোধাত্মক।

বাংলা সাহিত্যে নিম্নশ্রেণীর গণমানুষের ও তার সংস্কৃতির বিজয় সেদিন এভাবেই প্রথম সংঘটিত হয়েছিল। মনসামঙ্গল কাব্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাই একটি উজ্জ্বল 'মাইল-ফলক'।

তথ্য-সঙ্কেত

১ কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, *রচনা সংকলন,* দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ, প্রথম খণ্ড [প্রথম অংশ] (মস্কো, প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭৫, পৃষ্ঠা ২৬

২ সুভাষ মুখোপাধ্যায়, *বাঙালীরইতিহাস* [নীহাররঞ্জন রায়ঃ আদি পর্ব সংক্ষেপিত], বাংলাদেশ সংস্করণ (ঢাকা, মুক্তাধারা, ১৯৮৩), প্রথম সংস্করণ প্রসঙ্গে ভূমিকা।

৩ গোপাল হালদার, *সংস্কৃতির রূপান্তর,* বাংলাদেশে প্রথম সংস্করণ (ঢাকা, মুক্তধারা, ১৯৭৪), পৃষ্ঠা ১৮৬

৪ অরবিন্দ পোদ্দার, *মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে* মধ্যযুগ (কলিকাতা, উচ্চারণ, ১৯৮১), পৃষ্ঠা ৭৭

৫ হুমায়ুন কবির, *বাঙলার কাব্য,* (কলিকাতা, চতুরঙ্গ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৬৫), পৃষ্ঠা ৩৪-৩৬

৬ অরবিন্দ পোদ্দার, *মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ* , পৃষ্ঠা ১১৩

৭ আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (ঢাকা, বর্ণ মিছিল, ১৯৭৮), পৃষ্ঠা ৪০৩

৮ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, *'বাঙলা সাহিত্যে বাঙালী ব্যক্তিত্ব', বাংলাদেশ* [মনসুর মুসা সম্পাদিত], (বাঙলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৪), পৃষ্ঠা ২৮৭–২৮৮

৯ সাঈদ–উর–রহমান, *'মনসামঙ্গল কাব্য ও ইসলাম ধর্ম'*, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, জুন ১৯৮৫) পৃষ্ঠা ১৮৬

১০ যতীন সরকার, *বাঙালীর সমাজতান্ত্রিক ঐতিহ্য* (ঢাকা, ইউপিএল, ১৯৮৭) পৃষ্ঠা ১৭২–৭৩

১১ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, *হিন্দুদের দেব দেবী,* উদ্ভব ও *ক্রমবিকাশ,* তৃতীয় পর্ব (কলিকাতা, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লি·, ১৯৮০), পৃষ্ঠা ১৫২

১২ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, *ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য* (কলিকাতা, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৮৭) পৃষ্ঠা ১০

১৩ আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস* (কলিকাতা, এ মুখার্জী এন্ড কোং (প্রা·) লিমিটেড, ১৯৭৫), পৃষ্ঠা ৬৮

১৪ সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,* প্রথম খন্ড, পূর্বার্ধ, পঞ্চম সংস্করণ (কলিকাতা, ইস্টার্ন পাবলিশার্স ১৯৭০), পৃষ্ঠা ১৮৯

১৫ অন্ত্রবিভূতি, *মনসাপুরাণ,* (আশুতোষ দাস সম্পাদিত), কলিকাতা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮০) পৃষ্ঠা ৪৩১

১৬ বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য (সংকলিত), বিজয় গুপ্তের *পদ্মাপুরাণ* বা *মনসামঙ্গল* (কলিকাতা; পৃষ্ঠা ১২৮ [পরে বিজয় গুপ্ত, বসন্ত কুমার সংকলিত উল্লিখিত]

১৭ অন্ত্রবিভূতি, মনসাপুরাণ, পৃষ্ঠা ২৯৮

১৮ অন্ত্রবিভূতি, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩১৭

১৯ নারায়ণদেব, *পদ্মাপুরাণ,* তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত সম্পাদিত, (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতাঃ ১৯৪২) পৃষ্ঠা ৬৬

২০ বিজয় গুপ্ত, *পদ্মাপুরাণ* (জয়ন্তকুমার সম্পাদিত), (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২) পৃষ্ঠা ৩২০

২১ ঐ, পৃষ্ঠা ৩৭৭

২২ ঐ, পৃষ্ঠা ১৬২
২৩ অন্তবিভূতি, *মনসাপুরাণ,* পৃষ্ঠা ২৪৫
২৪ অন্তবিভূতি, *মনসাপুরাণ,* পৃষ্ঠা ২২৩
২৫ যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য (সম্পাদিত), কেতকাদাস খেমানন্দ রচিত *মনসামঙ্গল,* প্রথম খন্ড (কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৩), পৃষ্ঠা ২৪০ [পরে কেতকাদাস–ক্ষেমানন্দ, মনসামঙ্গল উল্লিখিত]
২৬ *Vipradasa's Manasa- Vijaya,* Sukumar Sen (ed), The Asiatic Society, Calcutta, 1953, (পরে বিপ্রদাস, *মনসাবিজয়* উল্লিখিত), পৃষ্ঠা ১৭০
২৭ অন্তবিভূতি, *মনসাপুরাণ,* পৃষ্ঠা ৪৩১
২৮ ঐ, পৃষ্ঠা ১৫৯
২৯ নারায়ণদেব, *পদ্মাপুরাণ,* পৃষ্ঠা ১৯৪
৩০ ঐ, পৃষ্ঠা ২১৭
৩১ নারায়ণদেব ও জানকীনাথ, *পদ্মাপুরাণ [মনসামঙ্গল]* (ঢাকা, নিউ এজ পাবলিকেশনস্, ১৩৮২], পৃষ্ঠা ১৪২
৩২ কেতকাদাস–ক্ষেমানন্দ, *মনসামঙ্গল,* (প্রথম খন্ড), যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৪৩, পৃষ্ঠা ৩৫৬
৩৩ বিজয় গুপ্ত (জয়ন্তকুমার সম্পাদিত), পৃষ্ঠা ২৫৭
৩৪ নারায়ণদেব, *পদ্মাপুরাণ,* পৃষ্ঠা ২৪৫–৪৬
৩৫ রংগলাল সেন, '*বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামো: ঐতিহাসিক পটভূমি,* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ডিসেম্বর ১৯৮১, পৃষ্ঠা ১০৮
৩৬ গৌতম ভদ্র, *মুঘল যুগে কৃষি অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ* (কলকাতা, সুবর্ণরেখা, ১৯৮৩), পৃষ্ঠা ৪৩
৩৭ ঐ, পৃষ্ঠা ৪০
৩৮ Max Weber, *Essays in Sociology,* Translated and edited with an introduction by H. H. Gerthd & C. Wright Mills. (London, 1970), P 400
৩৯ Weber, ibid, P 404

৪০ Karl Marx, *Capital* vol. III, (Progress Publishers, Moscow, 1971), P 593

৪১ Irfan Habib *"Usury in Medieval India,"* Comparative Studies in Society and History. vol. VII, 1964-65, PP. 393-419

৪২ নারায়ণদেব, পদ্মাপুরাণ, পৃষ্ঠা ২৩০

৪৩ ঐ, পৃষ্ঠা ৩২৯

৪৪ নারায়ণদেব ও জানকীনাথ, পদ্মাপুরাণ, দিলীপ রায় প্রকাশিক, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, পঞ্চম সংস্করণ, ১৩৮২, পৃষ্ঠা ২৪৫

৪৫ তন্ত্রবিভূতি, মনসাপুরাণ, পৃষ্ঠা ৯৫

৪৬ তন্ত্রবিভূতি, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২৩

৪৭ D.D. Kosambi, Culture and Civilization of Ancient India in Historical Outline, Vikas Publishing House, Pvt. Ltd, New Delhi, Sixth impression, 1981, P 100

৪৮ জয়া সেনগুপ্তা, মনসামঙ্গল কাব্যে সামাজিক পটভূমিকা ও নারী, অপ্রকাশিত পি এইচ· ডি· অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ৩৮

৪৯ ঋগ্বেদ সংহিতা, রমেশচন্দ্র দত্ত অনওদিত, ইউনাইটেড পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৭৬, প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় মন্ডল, পৃষ্ঠা ১৬৮

৫০ নারারণ ভট্টাচার্য, অথর্ববেদে ভারতীয় সংস্কৃতি (কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৩৭০), পৃষ্ঠা ৬

৫১ ঋগ্বেদ সংহিতা, পূর্বোক্ত, চতুর্থ মন্ডল, পৃষ্ঠা ২৯১

৫২ অতুল সুর, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৫

৫৩ ঐ, পৃষ্ঠা ৪৪

৫৪ আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ, আলবেরুণীর ভারত-তত্ত্ব (ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮২), পৃষ্ঠা ৪৩৬

৫৫ বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, প্রথম খন্ড (কলকাতা প্রকাশ ভবন, ১৯৭৬), পৃষ্ঠা ১৯৫

৫৬ নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব), (জোৎস্না সিংহ রায়-সংক্ষেপিত), ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায় ও লেখক সমবায় সমিতি, কলিকাতা, ১৩৮২ (সং), পৃষ্ঠা ৯১
৫৭ কেতকাদাস, মনসাবিজয়, পৃষ্ঠা ৫৬
৫৮ দ্বিজ বংশীদাসের কাব্য, বাইশা, পৃষ্ঠা ৫৯
৫৯ পদ্মাপুরাণ, পৃষ্ঠা ১৯৬-১৯৮
৬০ বিজয় গুপ্ত (জয়ন্তকুমার সম্পাদিত), পৃষ্ঠা ২৫২
৬১ ঐ, পৃষ্ঠা ৩১৪
৬২ ঐ, পৃষ্ঠা ১১৪
৬৩ অন্তবিভূতি, মনসাপুরাণ, পৃষ্ঠা ৮৫
৬৪ মনসাপুরাণ, পৃষ্ঠা ৮৬
৬৫ ঐ, পৃষ্ঠা ৮৭
৬৬ ঐ, পৃষ্ঠা ৮৭
৬৭ অন্তবিভূতি, মনসাপুরাণ, পৃষ্ঠা ৮৭
৬৮ মনসাপুরাণ, পৃষ্ঠা ৮৭
৬৯ বিজয় গুপ্ত (জয়ন্ত কুমার সম্পাদিত), পৃষ্ঠা ২৪৯-৫০
৭০ অন্তবিভূতি, মনসাপুরাণ, পৃষ্ঠা ১০৯
৭১ ঐ, পৃষ্ঠা ২৭০
৭২ অন্তবিভূতি, মনসাপুরাণ, পৃষ্ঠা ১৩৭
৭৩ ঐ, পৃষ্ঠা ১৪৩
৭৪ ঐ, পৃষ্ঠা ২২১
৭৫ অন্তবিভূতি, মনসাপুরাণ, পৃষ্ঠা ২৮৯-৯০
৭৬ মনসাবিজয়, পৃষ্ঠা ১৬৯
৭৭ পদ্মাপুরাণ, পৃষ্ঠা ১৯৫
৭৮ কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, মনসামঙ্গল, পৃষ্ঠা ১৮৫-৮৬
৭৯ অন্তবিভূতি, মনসাপুরাণ, পৃষ্ঠা ৫৪৬